ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

নজরুলসাহিত্যে প্রতিফলিত ধর্মীয় নৈতিকতার স্বরূপ

* আলমগীর হোসেন খান

সারসংক্ষেপ: কাজী নজরুল ইসলাম ধর্মীয় উন্মাদনায় মত্ত প্রধানত দু'টি জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টত বুঝতে পেরেছিলেন যে ধর্মান্ধদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে ধর্মের নৈতিক বিধানগুলোর অনুসরণের পথ দিয়েই তা করতে হবে। কেননা বিশ্বের প্রচলিত প্রতিটি ধর্মই মানুষকে একদিকে যেমন সত্য-শিব-সুন্দরের পথে পরিচালিত হতে বলে তেমনি আবার ধর্মের নামে অন্যের অধিকার হরণ, হত্যা, জিঘাংসা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতিকে নিরুৎসাহিত করে। এজন্য নজরুল তাঁর সাহিত্যে ধর্মের সেই সকল দিকের উপর গুরুত্বারোপ করেন যেগুলো মানুষের মধ্যকার ধর্মীয়, নৈতিক ও মানবীয় গুণগুলোকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তিনি ধর্মকে বর্জন নয় বরং ধর্মের মধ্যে থেকেই মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে বলেন। এজন্য তিনি তাঁর সাহিত্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, উদারতা, মানবিকতা, দেশপ্রেম, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, জাতি-ধর্ম-বর্ণভেদ দূর, কুসংস্কারের অবলোপন, নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সত্যের প্রতিষ্ঠা, বিবেকের শাসন, আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠাকে মূল উপজীব্য করেছেন।

ভূমিকা

প্রতিটি ধর্মেই তার অনুসারীদেরকে সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে চালিত করার জন্য কিছু দিক-নির্দেশনা রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মের এই বিধানগুলোর সাথে নৈতিকতার নীতিগুলো মিলে যায়। ধর্ম ও নৈতিকতার মূল আলোচ্য বিষয় মানুষ। উভয়ের উদ্দেশ্য মানুষকে সত্য ও সুন্দরের দিকে পরিচালিত করা। যুগের আবর্তনে মানুষ যখনই বিপথগামী হয়েছে, সুন্দরের চর্চার পরিবর্তে অসুন্দরের চর্চা করেছে, নৈতিকতার পথ থেকে সরে গেছে তখনই স্রষ্টার পক্ষ থেকে সুন্দরের ও শান্তির বার্তা নিয়ে আগমন করেছেন বার্তাবাহক, সমাজ সংস্কারক অথবা নীতি-শিক্ষক যারা সমাজের আমূল পরিবর্তন করেছেন, অসুন্দরের স্থলে সুন্দরকে, অশুভের স্থলে শুভকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুভ ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় তাঁরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশা-লিঙ্গ প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছেন। যাঁরা শান্তি, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বপূর্ণ নৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাঁর সাহিত্যভাণ্ডারের মধ্য দিয়ে নৈতিক পথভ্রষ্ট ও দিক্‌ভ্রান্ত জাতিকে সত্য-সুন্দরের দিকে চালিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ধর্মের নৈতিক দিকগুলোর উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ধর্মীয় উন্মাদনাময় জাতিকে ধর্মের মধ্য দিয়েই অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তৎকালীন জাতিসমূহের মধ্যকার অবিশ্বাস, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ; ধর্ম সম্প্রদায়গুলোর অধার্মিক কর্ম, কপটতা ও ভণ্ডামি; মানবিকতা ও দেশপ্রেমের অভাব প্রভৃতি প্রেক্ষাপট তাঁকে এই চিন্তার ক্ষেত্রে খোরাক জুগিয়েছিলো।

---

* এমফিল ফেলো, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; প্রভাষক (দর্শন) ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

নজরুলের সমকালে যা ছিলো প্রাসঙ্গিক, বর্তমানের বিশ্বসমাজ প্রেক্ষাপটে তা আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হিসেবে দেখা দিয়েছে। ধর্মীয় অজ্ঞতা ও নৈতিক অবক্ষয় চরম আকার ধারণ করেছে। ফলে অধার্মিক এবং অনৈতিক কর্ম দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বজুড়ে ধর্মের নামে বোমাহামলা করে মানুষ হত্যা, গো-রক্ষার নামে মানুষ হত্যা, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংস ঘটনা, পরধর্মানুসারীদের বাসগৃহ ও উপাসনালয়ে হামলা, দিনে-দুপুরে মানুষ হত্যার মতো অসংখ্য ঘটনা যার প্রমাণ। অনেকে মনে করেন ধর্ম ও নৈতিক নীতি অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে এই সকল সমস্যার সমাধান। নজরুলও বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষের মধ্যে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করতে না পারলে জগৎ থেকে অশুভ শক্তির দমন সম্ভব হবে না। এজন্য তিনি তাঁর সাহিত্যের বড় একটা অংশ জুড়ে ধর্মের সেই সকল বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন যেগুলো নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো নজরুলের সাহিত্যে প্রতিফলিত ধর্মের নৈতিক নীতিগুলোর স্বরূপ বিশ্লেষণ করা।

ধর্ম ও নৈতিকতার সম্পর্ক

ধর্ম হচ্ছে এমন এক প্রকার অলৌকিক শক্তি বা দৈবসত্তার প্রতি বিশ্বাস ও ভয় স্থাপন, যার কাছে মানুষ আত্মসমর্পণ করে এবং যা মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে।[১] অন্যকথায় মানুষের সামাজিক জীবনকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা; মানুষকে ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করা; এবং পরিণামে পরমসত্তার সন্ধান দেওয়াই ধর্মের কাজ।[২] ধর্ম মানুষকে তার পরম প্রভুর আনুগত্য ও সহজ-সরল তথা মঙ্গলের পথে চলার জন্য নির্দেশনা দেয়; সকল ধরনের অমঙ্গল কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে। অন্যদিকে যে চেতনা মানুষকে সামাজিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে এবং সামাজিক জীবন কল্যাণপ্রসু করতে সাহায্য করে সে চেতনাই হলো নৈতিকতা বা নীতিবোধ।[৩] মানবজীবনের কল্যাণের স্বরূপ, পরমাদর্শ, আচার-আচরণের ভালো-মন্দ, এবং উচিত-অনুচিত নিয়ে পর্যালোচনা করাই নীতিদর্শনের প্রধান ও মৌলিক কাজ।[৪]

ধর্ম হতে নৈতিকতার উৎপত্তি নাকি নৈতিকতা থেকে ধর্মের উৎপত্তি এ নিয়ে দর্শনের ইতিহাসে রয়েছে বিস্তর মতপার্থক্য। প্রখ্যাত আমেরিকান প্রয়োগবাদী দার্শনিক উইলিয়াম জেমস বিশেষ কোনো ধর্মের কথা না বললেও তিনি মনে করেন মানুষের মধ্যে নৈতিকবোধের সৃষ্টি হতে পারে ধর্ম থেকে। তাঁর মতে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ধর্মগুলো মানুষের মধ্যে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়।[৫] এ সংক্রান্ত *ঐশ্বরিক আজ্ঞা মতবাদ* অনুসারে, কোনো কাজ বা ক্রিয়া কেবল তখনই সঠিক বা ভুল হয় যখন স্বয়ং স্রষ্টা কোনো ক্রিয়াকে আজ্ঞাপিত বা নিষিদ্ধ করে।[৬] তাই অতীব কঠোর নীতিপরায়ণ জন প্রেস্টন মনে করেন কোনো কিছু ভালো এজন্য যে, স্রষ্টা তাকে ভালো বলেছেন।[৭] দার্শনিক উইলিয়াম পেলিও ধর্মের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ককে স্বীকার করে বলেন যে, স্রষ্টার ইচ্ছা মানুষের সেইসব কর্মকে তাড়িত করে যেসব কর্ম সর্বদা নৈতিকভাবে বাধ্যতামূলক।[৮] তাঁদের মতের সাথে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক রেঁনে ডেকার্ট এবং প্রখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক এর মতের মিল লক্ষ করা যায়।[৯] তাঁরা মনে করেন স্রষ্টার ইচ্ছাই নীতি। স্রষ্টা যা চান তাই ভালো, তিনি যা পছন্দ করেন না তাই মন্দ।

ধর্ম থেকে নৈতিকতার উৎপত্তি বলে উপর্যুক্ত দার্শনিকবৃন্দ মনে করলেও ইমানুয়েল কান্ট ও জেমস মার্টিনিও প্রমুখ নীতিবিদ মনে করেন নৈতিক বাধ্যবাধকতাবোধ কোনো না কোনোভাবে ধর্মীয়বোধকে উৎসাহিত করে থাকে।[১০] ফলে ধর্ম থেকে নৈতিকতার উৎপত্তি নয় বরং নীতি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। ধর্ম থেকে নীতির উৎপত্তি হোক আর নীতি থেকে ধর্মের উৎপত্তি হোক, উভয়ই যে একে অপরের উপর নির্ভরশীল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মহাত্মা গান্ধীও মনে করতেন যে, ধর্ম ও নৈতিকতা সত্য; এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল।[১১] ধর্ম ও নৈতিকতা এমন কতগুলো ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যেগুলো মৌলিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে জড়িত করে। ফলে দেখা যাচ্ছে, ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। সুতরাং বলা যায়, ধর্ম ও নৈতিকতা আলাদা দু'টি প্রত্যয় হলেও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে উভয়ই প্রায় অভিন্ন। উভয়ই চায় সামাজিক সংহতি, সহনশীলতা ও সামাজিক সম্প্রীতি অর্জন এবং সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। এদিক থেকে বলা যায় নৈতিকতা ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।[১২]

প্রধান প্রধান ধর্মের ধর্মীয় নৈতিকতার সারকথা

পৃথিবীতে বিদ্যমান প্রতিটি প্রচলিত ধর্মেই কিছু নৈতিক আদর্শ বা নীতিতত্ত্বের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। ধর্মানুসারীদের সঠিকভাবে চালনা করার জন্য কোন্ কাজটি করা উচিত এবং কোন্ কাজটি করা অনুচিত তা নির্ধারণ করে দেয়। প্রাচীন সনাতন ধর্মে সমাজের এক গোত্রকে অন্য গোত্রের খাদ্য, পেশা, বিবাহ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বর্ণ-প্রথার সৃষ্টি হয়। এদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা নীতি রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের নিজ বর্ণ অনুযায়ী কাজ করাই নৈতিক অন্যথা অনৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। হিন্দু নীতিতত্ত্বে চারটি 'আশ্রম' নীতিবিদ্যার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রথম স্তর ব্রহ্মচর্য অনুসারে, পবিত্র জ্ঞানের উপর কর্তৃত্ব এবং ক্রোধ, লোভ, ইন্দ্রিয়ভোগ, কামনা, বাসনা এবং অপর জীবে কষ্ট না দেয়া, পিতা-মাতা ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে আত্মার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করাই এই স্তরের লক্ষ্য; সংসার ও সামাজিক দায়িত্ব পালন হলো ২য় স্তর বা গার্হস্থ্য স্তর; তৃতীয় স্তর বা বানপ্রস্থে মানুষকে সংসারের যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করে বিদ্যাবুদ্ধি বা আধ্যাত্মিক আলোর সন্ধানে জঙ্গলে বসবাসকে উৎসাহিত করে; এবং সর্বশেষ স্তর হলো সন্ন্যাসব্রত বা ব্রহ্মার সান্নিধ্যলাভের স্তর।[১৩] *মনুসংহিতায়* ধর্মের যে 'দশটি বাহ্যলক্ষণ'[১৪] বা স্বরূপের উল্লেখ করা হয়েছে তাতেও হিন্দু ধর্মের নৈতিক দিকটি ফুটে উঠেছে। তাছাড়া দুষ্ট অভিপ্রায়ে শপথ গ্রহণ, মিথ্যাবাদিতা, চক্রান্ত, পরচর্চা, অসাধুতা, স্বৈরাচার, ব্যাভিচার, চুরি, হত্যা প্রভৃতিকে অত্যন্ত জঘন্য কাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৫] হিন্দু ধর্মে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের জন্য নৈতিক পথকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।[১৬] আর রামায়ণে এতো বেশি পরিমাণে নৈতিকতা ও মানবতার কথা বলা হয়েছে যে এর জন্য অনেকে রামায়ণকেই *কাব্যে রূপান্তরিত নীতিবিজ্ঞান* বলে মনে করেন।[১৭]

সনাতন ধর্ম বর্ণভেদ প্রথাকে স্বীকার করলেও গৌতম বুদ্ধ মানুষের মধ্যে কোনো বর্ণভেদপ্রথা স্বীকার করেননি। তাঁর মতে শ্রেণিভেদ একটি ভয়ঙ্কর ব্যাধি; যা সমাজে প্রবেশ করলে

মানুষকে তিলে তিলে পঙ্গু করে দেয়।[১৮] *অষ্টাঙ্গিক মার্গ* বৌদ্ধ নৈতিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। বৌদ্ধধর্মে নৈতিকতার দু'টি দিক আছে, একটি নঞর্থক, অপরটি সদর্থক। তিনটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের নৈতিকতার ধারণাকে প্রকাশ করা হয়। অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকা; ভালো কাজ সম্পাদন করা এবং নিজের মনকে পরিশুদ্ধ কর, এই তিনটি সত্যের মধ্যে প্রথমটি নঞর্থক এবং পরের দুটো সদর্থক। নঞর্থক দিকটির ভিত্তি হল পাঁচটি নিয়ম অর্থাৎ সুপ্রশিদ্ধ পঞ্চশীল: প্রাণী হত্যা থেকে বিরত রাখা, অপ্রদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকা, যৌনাচার থেকে বিরত থাকা, মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা, এবং মাদক দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা।[১৯] এই *পঞ্চশীল* অসংখ্য নীতিকে অনুর্ভুক্ত করে। প্রাণী হত্যা না করা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কারো ক্ষতিসাধন না করা, শারীরিক বা মানসিকভাবে অনিষ্টসাধন না করা, কষ্ট না দেয়া, নিপীড়ন না করাকে অন্তর্ভুক্ত করে; চুরি করা থেকে বিরত থাকা বলতে পার্থিব সব জিনিসের তথা বিষয়সম্পত্তি, ধন-দৌলত, টাকা-পয়সার লোভ, লালসা, মোহ থেকে বিরত রাখা এবং উদাসীন মনোভাব তৈরি করাকে বোঝায়; ইন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহার ও ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকা হলো যৌনাচার থেকে বিরত থাকা; মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা বলতে অপ্রিয়, অশ্লীল, কটু, কর্কশ, অসার কথা, অপপ্রচার, সত্যগোপন, পরদূষণ প্রভৃতি থেকে দূরে থাকা বোঝায়; এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম শীলটি দ্বারা মনের পবিত্রতাকে নির্দেশ করে, কেননা মন যদি অপবিত্র হয় তাহলে সব সাধনা, সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।[২০] নঞর্থক দিক ছাড়া সদর্থক দিকও রয়েছে বহু। দান করা তাদের মধ্যে অন্যতম একটি। কারোও প্রতি হিংসা নয় বরং সকলের প্রতি ভালোবাসা ও করুণা এবং সকলের জন্য সুখ কামনা করা একজন বৌদ্ধের অবশ্য পালনীয় শর্ত।

বৌদ্ধ ধর্মের শ্রেণিভেদহীনতার নীতিটি ইসলাম ধর্মেও দেখা যায়। ইসলাম ধর্ম নৈতিকভাবে জীবন-যাপনের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে। মুসলিম সংস্কৃতিতে নৈতিকতার ভিন্ন ভিন্ন সমার্থক শব্দ থাকলেও এটি প্রায়শই *স্বাভাবিক স্বভাবের বিজ্ঞান* (ইলম-উল-আখলাক), *আচরণের বিজ্ঞান* (ইলম-উস-সুলুক) এবং *আধ্যাত্মবাদের বিজ্ঞান* (ইল-মুত-তাসাউফ) হিসাবে ব্যবহৃত হয়।[২১] ইসলাম ধর্মে কিছু কাজকে উৎসাহিত করা হয়েছে আর কিছু কাজকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যে সকল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্যে দান, বদান্যতা, সত্যবাদিতা, মানবতা, ন্যায়পরতা, দয়া, ধৈর্য, সহনশীলতা প্রভৃতি অন্যতম। নিষেধকৃত কাজগুলোর মধ্যে আত্মহত্যা, অমানবিকতা, রাহাজানি, অপরের ক্ষতি, হত্যা, অপরের ধনসম্পদ আত্মসাৎ, মদ, জুয়া, কুৎসা, মিথ্যা শপথ, সুদ, ঘুষ, চুরি, মিথ্যা বলা প্রভৃতি অন্যতম। তাছাড়া মানুষের মধ্যকার ভেদাজ্ঞান ভুলে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইসলামের নির্দেশ। পরধর্মের প্রতি সহনশীলতা, মানবাধিকার, ক্রীতদাস প্রথার বিলোপসাধন, নারীর প্রতি সামাজিক মর্যাদা প্রদান, বৈরাগ্যবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদবিরোধী চেতনা প্রভৃতি ইসলামের সর্বজনীনতার দিক। সকল ধর্মের ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা পবিত্র কোরআন ও হাদিসের অসংখ্য জায়গায় বিধৃত হয়েছে। কথা ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি বিধানও ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। ইসলাম ধর্ম বা নীতিবিদ্যায় গোঁড়ামি বা হঠকারিতার কোনো স্থান নাই।[২২] ইসলাম ধর্মে মহানবি (সা:) কে উত্তম চরিত্রের অধিকারী বলা হয়েছে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে সকলকে নির্দেশ দিয়েছে।

খ্রিস্ট ধর্মে যিশুর সঙ্গে একাত্মার মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে একাত্মা হওয়ার মধ্য দিয়েই নৈতিক আবেদনকে লাবণ্যময় করে তোলা হয়েছে।[২৩] খ্রিস্টীয় নৈতিকতার মূলকথা হলো যিশুকে অনুসরণ করা। অন্যান্যদের মধ্যে অপর মানুষের মঙ্গল কামনা করা যদিও সে শত্রু হয়; সব ধরনের তিক্ততা, রাগ, দ্বেষ, হট্টগোল ও অসৎ বাক্য, অমঙ্গল কাজ থেকে দূরে থাকা অন্যতম নৈতিক শিক্ষা। এমনকি কেউ একগালে থাপ্পর দিলে অন্য গাল এগিয়ে দেয়া এবং একটি ঘড়ি নিয়ে নিলে কোট নিতে বাধা না দেয়ার কথাও বলা হয়েছে।

বড় বড় ধর্মের বাইরে শিন্তো ধর্ম পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছে। কন্‌ফুসিয়াস সৎ ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তিকে সমাজের শ্রেয় ব্যক্তি হিসেবে দেখেছেন। তাঁর নৈতিক শিক্ষা হলো বাড়াবাড়ি না করা, কারো ক্ষতি না করা, নিজের জন্য যা কামনা অন্যের জন্যও তাই কামনা করা, এমন আচরণ না করা যা অন্যের থেকে আশা করা হয় না, স্বর্গকে পেতে হলে মানুষের মনকে জয় করা প্রভৃতি।[২৪] *তাও* ধর্মের নৈতিক আলোচনায় মাদকদ্রব্য, হত্যা, মিথ্যাভাষণ, চৌর্যবৃত্তি এবং ব্যাভিচার এই পাঁচটি কাজকে বর্জনীয় করেছে; আর জনক-জননীর প্রতি শ্রদ্ধা, সম্রাট ও গুরুর প্রতি আনুগত্য, সর্বজীবে দয়া, ধৈর্যধারণ ও ভুলকাজ থেকে বিরত থাকা, আত্মত্যাগ, দাসমুক্তি, কূপ খনন ও রাস্তা নির্মাণ, জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দান, সামাজিক মঙ্গলসাধন এবং ধর্মপুস্তক পাঠ এই দশটি কাজকে অবশ্য পালনীয় করেছে।[২৫] শিখ ধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা এবং অহিংসা, ত্যাগ এবং তিতিক্ষা সদ্‌গুণ বলে বিবেচিত হয়।[২৬] তাছাড়া সম্যগ দর্শন বা সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্যগ জ্ঞান বা সংশয়শূন্য ও ভ্রমমুক্ত বিশদ জ্ঞান এবং সম্যগ চরিত্র বা হিত আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া এবং অহিতকর আচরণ থেকে বিরত থাকা এই *ত্রিরত্ন* জৈন ধর্মের নৈতিক বিধান হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়।[২৭]

নৈতিকতার আলোচনায় নজরুলের অবস্থান

দর্শনের ইতিহাসে নৈতিকতাকে প্রধানত দু'টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়; যার একটি ধর্মীয় নৈতিকতা ও অন্যটি ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিকতা। ধর্মে বিধৃত নৈতিক উপদেশগুলো খুঁজে বের করে ধর্মানুসারীদেরকে শুভ ও মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করাই এর মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে সমাজে প্রচলিত প্রথা ও রীতি-নীতি অনুসরণ করার ফলে যে অভ্যাস তৈরি হয় এবং চরিত্র বা আচরণ গঠিত হয় সেই আচরণের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত প্রভৃতির মূল্যায়ন করাই ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিকতা। ধর্ম ইহলোক এবং পরলোক উভয়কে কেন্দ্র করে নৈতিক নীতি প্রণয়ন করলেও ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিকতার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইহলোকের মঙ্গল দিকটি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ধর্ম সর্বজনীন নৈতিকতার কথা বললেও ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল মনে করেন নৈতিক মূল্যবোধ শাশ্বত কোনো কিছু নয় বরং দেশ-কাল-সময়ের প্রেক্ষিতে তা ভিন্নরূপ হয়।[২৮] কার্ল মার্কস মনে করেন, যতোদিন পর্যন্ত সমাজে শ্রেণি-বৈষম্য দূর না হবে ততোদিন পর্যন্ত নৈতিকতা ফলপ্রসু হবে না। কেননা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার নৈতিকতা ও প্রলেতারিয়েট বা সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণির নৈতিকতা এবং চিন্তা-ভাবনা অন্য রকম।[২৯] ফ্রেডরিক নীটশেও মানুষের নৈতিকতার ক্ষেত্রে শ্রেণিবিভাগের পক্ষপাতি। তাঁর মতে সমাজের প্রভুদের জন্য প্রভু নৈতিকতা এবং দাসদের জন্য দাস নৈতিকতা প্রণয়ন করতে

হবে।[৩০] সুতরাং বলা যায় যে, ধর্মীয় নৈতিকতা সর্বজনীন হলেও ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিকতা স্থান-কাল, শ্রেণি-বর্ণ-লিঙ্গভেদে ভিন্নতর হতে পারে। এর কোনো সর্বজনীন স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।

নজরুল মানুষের মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশা-লিঙ্গভেদে পার্থক্য করতে চান না। তিনি সকল মানুষকে দেখেন স্রষ্টার সৃষ্টি মহামানব হিসেবে; যেখানে কেউ কারো প্রভু নয়, সবাই সমান। ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, মালিক-শ্রমিক, নারী-পুরুষ সবাই তাঁর নিকট সমতুল্য। নজরুলের এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। যেমন ইসলাম ধর্ম মানুষের মধ্যকার ভেদজ্ঞানকে অস্বীকার করেছে। যোগ্যতাসম্পন্ন হাবশীকে শাসক হওয়ার সুযোগ রেখে তার অনুগত হতে সবাইকে নির্দেশ দিয়েছে। তাছাড়া ইসলামের নবি (সা:) এবং ইসলামের খলিফাদের সততা ও আড়ম্বরপূর্ণ নৈতিক জীবন নজরুলকে আকৃষ্ট করেছে। যেমন 'উমর ফারুক' কবিতায় খলিফা উমর (রা:) কর্তৃক ভৃত্যকে উটের পিঠে নিয়ে এর উটের রশি ধরে টানা, অন্য ধর্মীয় উপাসনালয়কে সংরক্ষণ করা, বিলাসহীন জীবনযাপন, ন্যায়পরতা প্রভৃতি দিক ফুটিয়ে তুলেছেন। খলিফার মাহাত্ম্য বর্ণনাই নজরুলের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং এর মাধ্যমে ব্যক্তিমানুষ ও রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে নৈতিক জীবনের প্রতি আগ্রহী করা অন্যতম লক্ষ্য।

ফলে ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিক মতবাদীদের শ্রেণিবৈষম্যমূলক মতবাদকে গ্রহণ করা নজরুলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এজন্য মার্কসবাদী সাম্যবাদের দ্বারা জীবনের এক পর্যায়ে প্রভাবিত হলেও তৎকালীন সময়ে সাম্যবাদের সাথে নাস্তিক্যবাদের সম্পর্ক থাকায় নজরুল শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদী সাম্যবাদের সাথে না থেকে ইসলামি সাম্যবাদীতে আশ্রয় নেন। আর এর পেছনে ইসলামের মানবপ্রেমের বিধানসমূহ নজরুলকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ মনে করেন, ইসলামের প্রতি আস্থা স্থাপনে ও বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রতি বিশ্বাসের পেছনে রয়েছে ইসলামের মানবপ্রেমের বিধানসমূহ। কবি জীবনের যা ব্রত ইসলামের মতো আর কোনো ধর্ম এত দৃঢ়তার সঙ্গে এমন স্পষ্ট করে বলেনি।[৩১] তাই নজরুল সব কিছুকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখার পক্ষপাতি। ফলে যখনই কোনো নৈতিক আদেশ দিয়েছেন তা কোনো না কোনোভাবে ধর্মীয় নৈতিকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। ধর্মের প্রতি আনুগত্যশীল নজরুল মনে করেন কুসংস্কারমুক্ত ধর্মের বিধানের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত মানবকল্যাণ। মানুষের আলোচনায় বারবার ফিরে গেছেন স্রষ্টার কাছে। স্রষ্টার উদারতা, করুণা, পক্ষপাতহীনতার উদাহরণ দিয়ে মানুষকে আহ্বান করেছেন উদারতার, পক্ষপাতহীনতার। স্বাধীনতার আলোচনাতেও মুসলিম শাসকদের বীরত্বের পাশাপাশি অর্জুনের, হযরত আলী (রা:) ও খালেদ (রা:) এর বীরত্বকে সামনে এনেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর সাম্য ও রাজনৈতিক আলোচনাতেও ধর্মীয় নৈতিকতার দিকটি স্পষ্ট।

নজরুলসাহিত্যে ধর্মীয় নৈতিকতার স্বরূপ

কোনো কবি সাহিত্যিকই আকাশের সূর্যের মতো একর্ষি নন। তিনি কোনো না কোনো সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি বা ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠেন। সে কারণে তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল, চারপাশের মানুষ, ঘটনাবলী এবং এসবের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার অবলম্বন থেকে

কখনো কখনো অভিজ্ঞতা পেয়ে থাকেন।[৩২] নজরুলও এর ব্যতিক্রম নন। তিনি যে সমাজে বসবাস করতেন সে সমাজ স্পষ্টত দু'টি ধারায় বিভক্ত ছিলো; যার একদিকে ছিলো মুসলমান আর অন্যদিকে ছিলো হিন্দু। বৈরিতাই ছিলো তাদের মূলমন্ত্র। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ বলেন -"তুর্কী-মুঘল আমলের পরাধীনতার স্মৃতিজাত ক্ষোভ ছিলো হিন্দু মনে আর সংখ্যাগুরু হিন্দুর বর্ধিষ্ণু বিত্তে-বিদ্যায় আর প্রতাপে-প্রভাবে শঙ্কিত হচ্ছিল মুসলিম।"[৩৩] ফলে চির-পোষিত মনোমালিন্যের কারণে বিপরীতমুখী এই দু'টি জাতির মধ্যে সাংঘাতিক দাঙ্গা সংঘটিত হতো। নজরুল বেদনার সাথে প্রত্যক্ষ করেন ধর্মের মধ্যে উদার নৈতিকতার শিক্ষা থাকলেও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কিছু অনুসারী তা ভুলে যায়; জড়িয়ে পড়ে স্বার্থের দ্বন্দ্বে। ধর্মের মুখোশ পরে করে অধার্মিক কাজ। ধর্মের নৈতিক বিধান প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী নজরুল সত্য-সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য, সকল ধরনের অশুভ ও অমঙ্গলকে সমাজ হতে দূর করার জন্য কলমযুদ্ধ শুরু করেন। তাঁর এই ইচ্ছাকে প্রবলতর করে তৎকালীন সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শাসক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব, মুসলমানদের মধ্যকার 'আশরাফ-আতরাফ'ভেদ, হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দুদের 'ছুৎমার্গ', বর্ণভেদ, ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামি, পরাধীনতা, কপটতা ও ভণ্ডামি, অমানবিকতা ও আত্মঅবমাননা, ব্যবসা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অসততা, সর্বোপরি নৈতিকতার চরম অবক্ষয়। তিনি এগুলোকে দেখেন সমাজে 'বিষফোঁড়া' হিসেবে। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ এর চিঠির উত্তরে নজরুল এই বিষফোঁড়াকে সমাজ হতে দূর করতে 'হাতুড়ে ডাক্তার' এর পরিবর্তে 'অস্ত্র-চিকিৎসকে'র ভূমিকা পালন করতে চেয়েছেন। তৎকালীন বোদ্ধামহলও চাইতেন সমাজে বিদ্যমান ধর্মের নামে অধার্মিক কার্যাবলী এবং অনৈতিক দিকগুলো সবার সামনে উন্মোচিত হোক। *সওগাত* পত্রিকার সাথে নজরুলের সম্পাদিত চুক্তিতে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সেখানে বলা হয়-"সাপ্তাহিক 'সওগাতে'র 'চানাচুর' বিভাগ পরিচালনা করবেন। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করবেন।"[৩৪] অন্যায়ের বিরুদ্ধে, 'কাঠমোল্লা' তথা ভণ্ড মোল্লা-পুরোহিতদের বিরুদ্ধে, ভণ্ড তপস্বীদের বিরুদ্ধে তিনি যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তা আমৃত্যু চালিয়ে গেছেন। এটাকে দেখেছেন ধর্মের অবশ্য পালনীয় নৈতিক বিধান হিসেবে। পূর্বেও দেখেছি অধিকাংশ চিন্তাবিদ ধর্মীয় বিধান পালনকেই নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

নজরুল ধর্মের নৈতিক বিধান প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা হিসেবে ধর্মীয় অজ্ঞতাকে দায়ী করেন। কেননা ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণেই মানুষের মধ্যে কুসংস্কার ভর করে। সাম্প্রদায়িকতা, পরমতঅসহিষ্ণুতা, গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা, পরধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্মীয় ও নৈতিকতার পরিপন্থী আচরণ; যার পেছনে অজ্ঞতাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এজন্য নজরুল ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞাত শ্রেণিকে ধর্মের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করতে গিয়ে বলেন যে, ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা; সকল ধরনের অন্যায় অবিচার, অকল্যাণ দূর করে শান্ত সুন্দর ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। ধর্ম মানে অন্যায় মেনে রণে ভঙ্গ দেয়া নয় বরং অত্যাচারীকে তার অত্যাচার থেকে বিরত রাখা। অন্যায়কে দৃঢ়ভাবে অন্যায় বলা ও এর প্রতিবাদ করাই ধর্ম। অন্যায়

দেখেও যারা এর প্রতিবাদ করে না নজরুল তাদের 'কাপুরুষ' হিসেবে আখ্যা দেন। তিনি বলেন- "ধর্ম-পূজারি হচ্ছে সত্যের পূজারি; সত্যের পূজারি কখনো কাপুরুষ হয় না।"[৩৫]

ধর্মীয় নৈতিকতার অন্যতম একটি দিক হলো সকল ধর্মের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করা, শ্রেষ্ঠত্বের দাবী থেকে অন্য ধর্মকে হেয় না করা। কেননা ধর্ম স্রষ্টার সৃষ্টির এক অপরূপ বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যেই তাঁর আনন্দ। স্রষ্টা চাইলে পৃথিবীতে কেবল একটি ধর্মই থাকতো। কিন্তু তিনি তা চাননি। এজন্যই হয়তো বিদায় হজের ভাষণেও মহানবি (সা:) সকল ধর্মের স্বাধীনতার কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন; ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কোরআনের 'সূরা কাফিরূনে'ও অসাম্প্রদায়িকতার প্রতিধ্বনি রয়েছে।[৩৬] অন্যত্র ভিন্ন ধর্মের উপাস্যকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। ধর্মীয় নৈতিকতার এই দিকটি নজরুলের মধ্যে লক্ষণীয়। তিনি বলেন-

কোনো 'ওলি' কোনো দরবেশ যোগী কোনো পয়গাম্বর,
অন্য ধর্মে, দেয়নি কো গালি,–কে রাখে তার খবর ?

... ...

নাই পরমত-সহিষ্ণুতা সে কভু নহে ধার্মিক,
এরা রাক্ষস-গোষ্ঠী ভীষণ অসুর-দৈত্যাধিক।[৩৭]

এদিক থেকে বলা যায় সকল অবতার-পয়গম্বর ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তাঁরা সমগ্র মানবজাতির জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু ধর্মমাতালরা তাঁদেরকে নিজস্ব সম্পদে পরিণত করেছে। আর এর ফলেই ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বড় হয়ে দেখা দেয়। তাই সকল প্রকার ধর্মভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করার আহ্বান জানিয়ে নজরুল বলেন-

> অবতার–পয়গম্বর কেউ বলেননি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রিশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি– আলোর মত, সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তেরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তেরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের, খ্রিস্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রিস্ট ক্রিশ্চানদের। কৃষ্ণ-মুহম্মদ-খ্রিস্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি। আর এই সম্পত্তিত্ব নিয়েই যত বিপত্তি।[৩৮]

অসাম্প্রদায়িক ভারত গঠনের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা ও কারিগর কবি নজরুল মনে করেন সাম্প্রদায়িকতা কোনো ধর্মের বিধান নয়। তিনি বলেন-'যাহারা অন্য ধর্মকে ও অন্য মানুষকে ঘৃণা করে বা নীচ ভাবে, তাহারা নিজেই অন্তরে নীচ, তাহাদের নিজেরও কোনো ধর্ম নাই'। 'উমর ফারুক' কবিতায় নজরুল দেখিয়েছেন ধর্ম অত্যন্ত সহনশীল। এক ধর্ম অন্য ধর্মের উপর আঘাত করে না, জবরদস্তি চালায় না; বরং তাদের জান-মাল ও উপাসনালয় রক্ষা করে। কিন্তু কোনো ধর্মানুসারী ধর্মের এই উদারনীতি গ্রহণ না করলে তাকে ধার্মিক বলা যায় না বরং সে গোঁড়া। এজন্যই বলা হয় 'বিশ্বাসবিহীন ধর্ম আকারসর্বস্ব এবং উদারতাবিহীন ধর্ম গোঁড়ামিরই নামান্তর'[৩৯]। ধর্মের উদারতার দিকটি নজরুল ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে-

তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণ্য নাহি করে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।
ভিন-ধর্মীর পূজা মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাওনি, হে বীর,

আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাকো পর-মত ॥
ক্ষমা করো হজরত ॥[৪০]

ধর্ম ও নৈতিকতার মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ। এজন্য পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই মানবের জয়গান করেছে। মানুষ স্রষ্টার সখা, বন্ধু, হাবিব। মানুষের হৃদয়ই সমস্ত কিছুর কেন্দ্রস্থল, এই হৃদয়ই দেবতার আবাসভূমি।[৪১] নজরুল মনে করেন এই মানুষের জন্যই সকল ধর্মাবতার ও কেতাবের আবির্ভাব। কিন্তু যে সকল ধর্মানুসারী কোরআন-পুরান-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-জেন্দাবেস্তা এবং গ্রন্থসাহেব রক্ষার জন্য মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করতে পারে, তাদের অধিকার হরণ করতে পারে তারা ধর্মের প্রকৃত অনুসারী নয়। কারণ ধর্মগ্রন্থের আগমন ঘটেছে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, অধিকার হরণ করার জন্য নয়। মানুষের এই হৃদয়ের মধ্যেই একাকার হয়ে রয়েছে সকল যুগের কেতাব, জ্ঞান, ধর্ম, যুগাবতার। সনাতন-বৌদ্ধ-ইসলাম-খ্রিস্টানসহ সকল ধর্ম গিয়ে মিশেছে এই মানবের মাঝে। এই হৃদয়ই কাশি, মথুরা, বৃন্দাবন, বুদ্ধ-গয়া, জেরুজালেম, মদিনা, কাবা-ভবন, মসজিদ, মন্দির, গির্জা। তাই স্রষ্টাকে খুঁজতে হলে এই হৃদয়ের মধ্যেই খুঁজতে হবে; কোনো মৃত পুঁথি ও কঙ্কালের মধ্যে নয়। ফলে এই মানুষকে অপমান ও ঘৃণা করে স্রষ্টার সাক্ষাৎ, তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে না বলে নজরুল মনে করেন। এজন্য তিনি 'মসজিদ ও মন্দির' প্রবন্ধে ধর্মরক্ষার নামে অহেতুক মারামারি, হানাহানি, মানুষের চেয়ে মন্দির-মসজিদকে বড় করে দেখার প্রবণতার সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, মানুষ, সে চাড়াল-ডোম যাই হোক না কেন, মন্দির-মসজিদের চেয়ে তার দেহ অনেক পবিত্র। নজরুল তাই ধর্মের আদত সত্যের অনুসরণ করতে সকলকে আহ্বান করেন; মানুষের মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার পুনর্জাগরণ কামনা করেন। এজন্য তিনি চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'[৪২] মানবতাবাদী দর্শনকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে বলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানুষের অপমান স্রষ্টার অপমান তুল্য। কিন্তু ধর্ম এবং ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে এই মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করলে, অপমানিত করলে, পশুর চেয়েও হীন মনে করলে নজরুল ব্যথিত হন। তিনি মানুষকে দেখেন ধর্ম-বর্ণ-জাতির উর্ধ্বে এক 'মহা-মানব' রূপে। তাই ধর্মভেদ ভুলে 'মানুষ-ধর্ম' প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্ব দেন। নজরুল বলেন-

> হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমাহারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া–মানব!–তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি! 'আমার মানুষ-ধর্ম।' ... মানবতার এই মহা-যুগে একবার গণ্ডি কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলো যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ–তুমি সত্য।[৪৩]

মানবপ্রেমিক নজরুল সাহিত্যালোচনায় প্রেমকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মানব প্রেমের শেষস্থল স্রষ্টাপ্রেম। স্রষ্টা যে সবকিছুর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন এর ইঙ্গিত পবিত্র কোরআনেও রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর নিজের মধ্যে প্রতিস্থাপন করেছেন প্রেম এবং সেই প্রেম উপস্থিত ও পরিব্যাপ্ত সবকিছুর মধ্যে।[৪৪] শিখ ধর্মেও বলা হয়েছে যে প্রত্যেকের হৃদয়েই স্রষ্টা লুকিয়ে আছেন এবং তাঁর আলো দ্বারাই সবার হৃদয় আলোকিত হয়।[৪৫] সুতরাং যারা সৃষ্টিকে ঘৃণা করে স্রষ্টাকে পেতে চায় তাদের সে আশা নিরাশা। নজরুল বলেন-

সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর, এ বিশ্ব-মায়ের বিশ্ব-ঘর
মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্ম-পর !
(তোরা) সৃষ্টিকে তাঁর ঘৃণা করে
স্রষ্টায় পূজিস জীবন ভরে,
ভস্মে ঘৃত ঢালা সে যে বাছুর মেরে গাভি দোওয়া ॥[৪৬]

ধর্মের মানবিক দিক নিয়ে নজরুলের পূর্বে কোনো বাঙালি দার্শনিক হয়তো এতো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেননি। নজরুলের মূলমন্ত্রই ছিলো 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান', 'মানুষধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম'। নজরুল এমন সমাজ প্রত্যাশা করেন যেখানে সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশা একত্রে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে পারে, স্বধর্ম স্বাধীনরূপে পালন করতে পারে। 'উমর ফারুক' কবিতাতে নজরুল মানবিকতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। ভৃত্যকে উঠের পিঠে চড়িয়ে খলিফার রশি টানা, ক্ষুধার্ত শিশুর ক্ষুধা মেটানোর জন্য কাঁধে করে আটা ও খেজুর বহন করার মাধ্যমে খলিফা উমর (রা:) যে মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাই ধর্মের শিক্ষা। তাছাড়াও তিনি 'সাম্যবাদী', 'মানুষ', 'বারাঙ্গনা', 'নারী', 'রাজা-প্রজা', 'সাম্য', 'কুলি-মজুর' প্রভৃতি কবিতাতে মানুষের প্রতি সহানুভূতি, করুণা, ও সমতার দিকের প্রতি গুরুত্ব দেন। সমাজের জাত-পাত, উঁচু-নিচু ব্যবধান দূরে রেখে লাঞ্ছিতশ্রেণির সকলের মধ্যে সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বলেন। তাঁর সাম্যবোধ গড়ে উঠেছে মানবতাবোধ প্রসূত চিন্তাধারা থেকে।[৪৭] কিন্তু জগতের অসাম্য বিদ্যমান থাকায় মহানবি (সা:) কে উদ্দেশ্য করে নজরুল বলেন-

পাঠাও বেহেশ্‌ত হতে, হজরত পুন সাম্যের বাণী,
আর দেখিতে পারি না মানুষে মানুষে এ হীন হানাহানি ॥
বলিয়া পাঠাও, হে হজরত
যাহারা তোমার প্রিয় উম্মত,
সকল মানুষে বাসে তারা ভালো খোদার সৃষ্টি জানি।[৪৮]

নজরুলের এই মানবতাবোধ নিপীড়িত, শোষিত, পদানত মানুষের মুক্তির জন্য, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। এজন্য তিনি ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, নারী-পুরুষ, মালিক-শ্রমিক, কুলি-মজুর সকলের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টনের কথা বলেন। 'গরিবের ব্যথা' কবিতায় ধনী ও গরিবের চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে ধনীকে গরিবের প্রতি করুণার দৃষ্টি দিতে বলেন। অন্যথায় 'কুলি-মজুর', 'জাগর-তূর্য', 'চাষার গান', 'ঈদের চাঁদ' 'শ্রমিকের গান' কবিতায় শ্রমিক বিদ্রোহের ইঙ্গিত দেন। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে নিঃস্ব নির্যাতিত, শোষিত, পীড়িত, দলিত-লাঞ্ছিত মানবতার চিত্রকে হৃদয়গ্রাহীভাবে উপস্থাপন করেছেন। সমাজের হীনপতিত ঘৃণ্য মানুষও কবির দেয়া সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত নয়; বারাঙ্গনাদেরকে যেমন তিনি শ্রদ্ধা করেন তেমনি 'কুহেলিকা'র জারজ জাহাঙ্গীর, বাঈজি সন্তান সকলের প্রতি কবির সমান সহানুভূতি।[৪৯]

নজরুল মানুষের মধ্যকার ভেদজ্ঞান দূর করে যে সাম্যভিত্তিক নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তার অন্যতম একটি দিক হলো নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা। নারীর সহযোগিতা ছাড়া যে তা সম্ভব নয় তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। অথচ মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীর

অর্ধেক অবদান থাকলেও যুগে যুগে ধর্মীয় অপব্যাখ্যার মাধ্যমে নারীর এই অবদানকে অস্বীকার করা হচ্ছিল এবং তাদের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল। এমতাবস্থায় নজরুল পুরুষদেরকে নারীদের অবদানকে স্মরণ করে দেয়ার পাশাপাশি নারীদেরকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন। পুরুষদের নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে বলেন-

যুগের ধর্ম এই–
পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই
শোনো মর্ত্যের জীব !
অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব ![৫০]

ধর্মের আলোচনায় নজরুল মনুষ্যত্বকে বিশেষভাবে আলোচনায় এনেছেন। মনুষ্যত্ব মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। বিশ্বের প্রচলিত প্রায় প্রতিটি ধর্মে মানুষের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু সনাতন ধর্মে প্রচলিত 'ছুঁৎমার্গ' ছিলো মানুষের মনুষ্যত্বের পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা। এই 'ছুৎমার্গ'কে নজরুল মানবের সবচেয়ে বড় অপমান হিসেবে দেখেছেন। এমনকি যে ধর্ম মানবের অপমানজনক এমন বিশ্রী প্রথাকে সমর্থন করে তা কোনো ধর্ম নয় বলে তিনি মনে করেন। এ প্রসঙ্গে নজরুলের ভাষ্য 'মানুষকে এত ঘৃণা করতে শেখায় যে ধর্ম তাহা কোনো ধর্ম নয়'।[৫১] তিনি মনে করেন এই বিশ্রী প্রথাকে নির্মূল করতে পারলে ভারত সফলতার পুষ্পে পুষ্পিত হবে। তাই জাত-বেজাতের ও ছোয়াছুঁয়ির এই জঘন্য ব্যাপারটিকে মানব মন থেকে দূর করার আহ্বান করে তিনি বলেন -

> হিন্দু মুসলমানকে ছুঁইলে তাঁহাকে স্নান করিতে হইবে, মুসলমান তাঁহার খাবার ছুঁইয়া দিলে তাহা তখনই অপবিত্র হইয়া যাইবে, তাঁহার ঘরের যেখানে মুসলমান গিয়া পা দিবে সেস্থান গোবর দিয়া (!) পবিত্র করিতে হইবে, তিনি যে আসনে বসিয়া হুঁকা খাইতেছেন মুসলমান সে আসন ছুঁইলে তখনই হুঁকার জলটা ফেলিয়া দিতে হইবে, –মনুষ্যত্বের কি বিপুল অবমাননা ! হিংসা, দ্বেষ, জাতিগত রেষারেষির কি সাংঘাতিক বীজ বপন করিতেছ তোমরা ! অথচ মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিতেছ, 'ভাই মুসলমান এস, ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই !' কি ভীষণ প্রতারণা ! মিথ্যার কি বিশ্রী মোহজাল ! এই দিয়া তুমি একটা অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিবে? শুনিয়া শুধু হাসি পায়।[৫২]

আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার প্রতি এই আঘাত দেখে নজরুল মর্মাহত হন। তিনি বুঝতে পারেন, একটা জাতি যখন বহুদিনের পরাধীনতায় নির্বীর্য হয়ে পড়ে, নিজের শক্তির উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, নিজের স্বাধীন ইচ্ছা নামক বস্তুর উপর বিশ্বাস থাকে না, তখন তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের মন্ত্র ধ্বনিত করাই মুখ্য কাজ। এজন্য সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভেই আত্মাশক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য 'বিদ্রোহী' রচনা করেন। বিদ্রোহীর 'আমি' মনুষ্যত্বসম্পূর্ণ ব্যক্তিমানুষ; যে সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী, শুভের জয় প্রত্যাশী এবং সকল ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতার বিপরীতে আত্মার শক্তিতে বলিয়ান। নজরুল এই আমিত্বের জয়গান করতে বলেন। তিনি বিশ্বাস করেন ব্যক্তির আমিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সমাজ থেকে সকল ধরনের ভীরুতা, পরাধীনতা দূর করা সম্ভব হবে। বলা যায়, নজরুলের দর্শনের মূল কথাই হলো 'আমি'র আমিত্ব। তাঁর আমি সকল বাধা বন্ধনমুক্ত চির স্বাধীন সত্তা ও নৈতিক মানুষ। তাঁর এই 'আমি' বিশ্বের সবকিছুর ঊর্ধ্বে। এই আমিকে

চিনতে পারলেই নিজের অসীমতাকে চেনা যায়। আর একবার নিজেকে চিনতে পারলে জগতের সবকিছু তার করতলে আসতে বাধ্য। আমিত্বের প্রচারক নজরুল এ প্রসঙ্গে বলেন- 'আমার বিশ্বাস, যে নিজেকে চেনে, তার আর কাউকে চিনতে বাকি থাকে না।'[৫৩] তাই সকল প্রকার ক্ষুদ্রতা, নিচুতা পরিহার করে আত্মার শক্তিতে শক্তিমান ও মুনষ্যত্বের বলে বলিয়ান হয়ে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়ানোর আহ্বান করে নজরুল বলেন-

> ডোম যদি ডোম বলিয়া সসঙ্কোচে পথ ছাড়িয়া আমাকে দীর্ঘ গোলামি সালাম ঠুকে, তাহা হইলে স্বতই তাহার প্রতি আমার একটা উঁচু-নিচুর ভাব আসে, কিন্তু সে যদি ডোম বলিয়া পরিচয় দিয়া সহজ হইয়া আমার পথে মানুষের মতো দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে বাহিরে আমি অভ্যাসবশত যতই ক্ষুব্ধ হই, অন্তরে তাহার আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্বজ্ঞানকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারি না।... আজ আমরা তাঁহাকেই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, তাঁহারই পায়ের ধুলা মাথায় লইব, –তিনি মুচি, ডোম, হাড়ি, যেই হউন–যিনি মহাবীর কর্ণের মতো উচ্চশিরে সর্বসমক্ষে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবেন, 'আমি সূতপুত্রই হই, আর যেই হই, আমার পুরস্কারই আমার গৌরব, আমার মনুষ্যত্বই আমার ভূষণ !'[৫৪]

আত্মসম্মানের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তিনি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র ঈদ-সম্মেলনের বক্তৃতায় বলেন-"সকল ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা বিসর্জন দিতে হবে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে নয়, ন্যায়ের অধিকারের দাবিতেই আমাদিগকে বাঁচতে হবে। আমরা কারও নিকট মাথা নত করব না–রাস্তায় বসে জুতা সেলাই করব, নিজের শ্রমার্জিত অর্থে জীবন যাপন করব, কিন্তু কারো দয়ার মুখাপেক্ষী হব না।"[৫৫] অবশ্য আত্মমর্যাদাজ্ঞান যেন আত্মপ্রেমে রূপান্তরিত না হয় সে প্রসঙ্গে 'আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ'- এ কবি বলেন, বলেন আত্ম-সুখ ও আত্ম-প্রেম মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে। সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠে। সামষ্টিক সুখের চেয়ে সে নিজের সুখের দিকে বেশি মনোনিবেশ করে। ফলে ব্যক্তির উন্নয়ন হলেও তা স্থায়ী হয় না। সকলের মঙ্গলের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত মঙ্গল। এদিক থেকে উপযোগবাদী দার্শনিক বেন্থামের দর্শনের সাথে নজরুলের দর্শনের মিল লক্ষ করা যায়।

আত্মশক্তিতে বলিয়ান হওয়ার আহ্বান করে 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা' প্রবন্ধে নজরুল বলেন- "শিবকে জাগাও, কল্যাণকে জাগাও। ... বল, কারুর অধীনতা মানি না, স্বদেশীরও না, বিদেশীরও না। যে অপমান করে তার চেয়ে কাপুরুষ হীন সে-ই, যে অপমান সয়। ...নিজের দুর্বলতার জন্য অন্যের শক্তির নিন্দা করো না।"[৫৬] এই আত্মশক্তির পাশাপাশি তিনি আবার স্বকীয়তার উপরও জোর দেন। কেননা তিনি বেদনার সাথে লক্ষ করেন, ঔপনিবেশিক আমলের শেষের দিকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান ব্যবসায়ীদের একটা অংশ নিজেদের আভিজাত্য জাহির ও ব্যবসার প্রসারের লোভে বাপ-দাদার নামের পরিবর্তে ইংরেজদের নামে দোকানের নামকরণ করা শুরু করে, এমনকি লিমিটেড কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্ট পদে কল্পিত ইংরেজ নাম রাখা শুরু হয়। যেমন কৃষ্ণ এর পরিবর্তে ক্রিস্টো; যা স্পষ্টত নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি ও স্বকীয়তার চরম অবমাননা। এমতাবস্থায় নজরুল ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা ও স্বকীয়তার উপর জোর দিতে গিয়ে বলেন-

> শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি না করিতে পারিলে জাতির পতন যেমন অবশ্যম্ভাবী, সত্যের উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না করিলে বাণিজ্যের পতনও আবার তেমনি অবশ্যম্ভাবী। মদকে মদ

> বলিয়া খাওয়ানো তত দোষের নয়, যত দোষ হয় মদকে দুধ বলিয়া খাওয়ানোতে। দুধের সঙ্গে জল মিশাইয়া বিক্রি করিলে লাভ হয় যত, প্রবঞ্চনা করার পাপটা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। একটা জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা যত বড় হউক, কিন্তু প্রবঞ্চনা বা মিথ্যার বিনিময়ে যেন তাহার জাতীয় বিশ্বস্ততা আর সুনাম বিক্রি করিয়া সে ছোট না হইয়া বসে। ভণ্ড লক্ষপতি অপেক্ষা দরিদ্র তপস্বী ঢের ভালো।[৫৭]

ধর্মের নৈতিক নীতি আলোচনায় নজরুল স্রষ্টার পক্ষপাতহীনতার উদাহরণ টেনে মানুষকে নিরপেক্ষ আচরণের পরামর্শ দেন। নজরুল মনে করেন স্রষ্টা যদি নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের হতেন তাহলে অন্য ধর্মের লোক একদিনও বাঁচত না। আল্লাহর নিরপেক্ষতার কারণেই তাঁর আশিসধারা বৃষ্টি হয়ে সকলের মাঠে-ঘাটে যেমন পতিত হয় তেমনি গজবও সকলের উপর সমানভাবে বর্ষিত হয়। এখানে কে মুসলমান, কে হিন্দু, কে বৌদ্ধ বা আশরাফ-আতরাফ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র তাঁর নিকট বিবেচনার বিষয় নয়। কিন্তু মানুষ স্রষ্টার এই নিরপেক্ষতা হতে কোনো শিক্ষা নেয় না; বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণভেদ তৈরি করে জগতকে অশান্ত করছে। এ প্রসঙ্গে নজরুল বলেন-

তাঁর সৃষ্টির উদার আকাশ সকলেরে থাকে ঘিরে,
তাঁর বায়ু মসজিদে মন্দিরে সকলের ঘরে ফিরে।
তাঁহার চন্দ্র সূর্যের আলো করে না ধর্মভেদ,
সর্বজাতির ঘরে আসে, কই আনো না তো বিচ্ছেদ !
তাঁর মেঘবারি সব ধর্মীয় মাঠে ঘাটে ঘরে ঝরে,
তাঁহার অগ্নি জল বায়ু বহে সকলেরে সেবা করে।
তাঁর মৃত্তিকা ফল ফুল দেয় সর্বজাতির মাঠে,
কে করে প্রচার বিদ্বেষ তবু তাঁর এ প্রেমের হাটে ?[৫৮]

একই দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে নজরুলের অভিভাষণে। সেখানে স্রষ্টার পক্ষপাতহীনতার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন-

> খোদার বা ভগবানের তো কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখিতে পাই না। যখন মড়ক আসে, হিন্দু-মুসলমান সমানে মরিতে থাকে, আবার যখন তাঁহার আশীষধারা বৃষ্টিরূপে ঝরিতে থাকে, তখন হিন্দু-মুসলমান সকলের ঘরে সকলের মাঠে সমান ধারে বর্ষিত হয়। আমরা কেন তবে খোদার উপর খোদকারি করিতে যাই ? খোদার রাজ্য খোদা চালাইবেন, তিনি যদি ইচ্ছা না করিবেন তাহা হইলে অমুসলমান কেহ একদিনও বাঁচিতে পারিত না। সব বুঝি, সব জানি, তবু ধর্মের মুখোস পরিয়া স্বার্থের দৈত্য যখন মাতলামি আরম্ভ করে–তখন আমরাও সেই দলে ভিড়িয়া যাই। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নির্মল-বুদ্ধি মহাপুরুষদের মস্তিষ্কও তখন মায়াচ্ছন্ন হইতে দেখিয়াছি।[৫৯]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানুষের কল্যাণের জন্য ধর্মের আবির্ভাব। কিন্তু কোনো ধর্ম যদি মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ করে তাহলে তাকে যথার্থ ধর্ম বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে আমিনুল ইসলাম বলেন-"যে ধর্মকর্ম করার অর্থ মানুষের অকল্যাণসাধন, তা যথার্থ পদবাচ্য নয়, ধর্মের ছদ্মবেশী কুসংস্কার মাত্র।"[৬০] এর সমর্থন প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই বিধৃত রয়েছে। অথচ এই কুসংস্কার তৎকালীন ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবহমান ছিলো। ধর্ম ব্যবসায়ীরা ধর্ম নিয়ে প্রতারণা করছিলো; অশিক্ষিতদের ধর্মের নামে ধর্মীয় উগ্রতা, উন্মাদনা, বিদ্বেষ, হিংসার মদ্যপান করাচ্ছিলো। ধর্মীয় নেতারা মুখে সকলকে ভাই বলে সম্বোধন করলেও অন্তরে বিষ

লুকিয়ে রাখতো এবং সুযোগ পেলেই ছোবল মারতো; যা স্পষ্টত ধর্ম ও নৈতিকতার পরিপন্থী। নজরুল ধর্মের নামে এই প্রতারণা সমর্থন করতেন না। প্রতারণা পাপের কাজ; আর তা যদি ধর্মের নামে করা হয় তাহলে সেটি আরো জঘন্যতর । যারা দ্বিমুখী আচরণ করে, ইসলাম ধর্মে তাদেরকে 'মুনাফেক' নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই মুনাফেকি আচরণ ধর্মসম্প্রদায়গুলোর মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করেছিলো। নজরুল মনে করেন মনের পশুকে জবেহ না করে শুধু কশাইয়ের মতো কোরবানি দিলে সে কোরবানি খোদার কাছে পৌঁছে না। তেমনি মনের মধ্যকার কুটিলতা গোপন রেখে ধর্মের পোশাক পরে মানুষকে ধোকা দেয়া সম্ভব হলেও খোদাকে দেওয়া যায় না। আর এজন্য নজরুল মুসলমানদের মুহর্‌রম মাসের হায় হোসেন মাতম ও হিন্দুদের দেয়ালি উৎসবের সমালোচনা করেন। কেননা তারা রক্ত ও আগুন নিয়ে খেলা করলেও দেশের জন্য রক্তের প্রয়োজন হলে তারা নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলে। তারা ভক্তি থেকে ভক্তিপূজা না করে স্বার্থের জন্য স্বার্থপূজা করে। তাই লক্ষ্মীর হাতে লক্ষ্মীভাণ্ড থাকায় তাঁর এতো কদর। ধর্মান্ধ ও স্বার্থান্ধ শ্রেণি তাদের স্বীয় স্বার্থের জন্য অজ্ঞান জনগণকে 'মার শালা যবন, মার শালা কাফের' বলে ধর্মীয় উগ্রতাকে উসকে দেয়। টিকি-দাড়ির মাধ্যমে স্রষ্টার সৃষ্টি মানুষের মধ্যে ভেদ তৈরি করে। নজরুল এই সকল ধর্মীয় নেতাদের ধর্মান্ধ, ধর্মমাতাল, শয়তান, ফেরেববাজ প্রভৃতি উপাধি দেন।

ধর্মীয় নেতাদের প্রতারণার পাশাপাশি নজরুল তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও প্রতারণা লক্ষ করেন। 'পেটে এক আর মুখে আরেক' এই ভণ্ডামি ছিলো তৎকালীন অধিকাংশ নেতার চরিত্র। নজরুল তাদের চরিত্র বলতে গিয়ে বলেন-"তাঁরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সুনাম কিনবার জন্যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তোমাদের উদ্বুদ্ধ করেন, আবার কোনো মুগ্ধ যুবক নিজেকে ঐ রকম বলিদান দিতে আসলে আড়ালে গিয়ে হাসেন এবং পরোক্ষে অভিসম্পাৎ করেন ! মনে করেন, 'এই মাথা-গরম' ছোকরাগুলো কি নির্বোধ।"[৬১] রাজনৈতিক নেতাদের এই চরিত্র ধর্মীয় নৈতিক বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

প্রতিটি ধর্ম দেশপ্রেমের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম ধর্মে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রয়োজনে মৃত্যুকে 'শহীদী মৃত্যু' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং কিছুক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে ইবাদতের পূর্বশর্ত করেছে। কিন্তু ভারতীয় জনগণ পরাধীন থাকলেও ধর্মের এই দিকটির প্রতি নজর দিতো না বরং ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য একদল স্বার্থান্ধ দেশমাতাকে ব্রিটিশদের সাথে গোপন আঁতাতের মাধ্যমে বিক্রি করে বিত্ত-বৈভবের মালিক হচ্ছিল। ব্যবসায়ী, তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের 'মুনাফেকি' আচরণের কারণে স্বাধীনতা বিলম্বিত হচ্ছিল। কপটতার বিস্তৃতি এতোদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিলো যে, স্বরাজ আনার জন্য যখন মহাত্মা গান্ধী আহ্বান করেন তখনও একশ্রেণি কৌশলে তাদের জাতের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য তাদের খদ্দরকে মিশ্র খদ্দর করতে দ্বিধা করে নাই। তারা ব্যস্ত ছিলো তাদের আখের গোছানোর কাজে। নৈতিকতার এই অধঃপতনকে নজরুল তুলে ধরে বলেন-

> উকিল দেখিতেছে মক্কেলের কত খাওয়া যায়। মহাজন দেখিতেছে দেনাদারের ভিটেমাটিটুকু কি করিয়া নেওয়া যাইতে পারে, ভদ্রলোক ভাবিতেছে ঢং দেখাইয়া কত বোকা ঠকানো যাইতে পারে। কেউ বা বুদ্ধি বিক্রয় করিতেছেন, কেউ বা দেশনীতির মেলা খুলিয়া বসিয়া আছেন। সবাই কে কার মাথা খাইবেন ভাবিয়া অস্থির। পরের

> ভাবনা ভাবিবার তিলমাত্র সময় নাই। এই যে সারাদিন এত ব্যস্ততা সে শুধু কি করিয়া দুর্বলকে পেষণ করিয়া আর একটু বড় সঞ্চয় করা যায় তাহার চেষ্টায় নিমিত্ত।[৬২]

দেশপ্রেমের পরিবর্তে নাগরিকদের এই ধরনের কর্মকাণ্ড ধর্ম ও নৈতিকতার চরম লঙ্ঘন। কেননা ধর্মে ও নৈতিকতাতে দেশপ্রেমকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই দেশপ্রেমের খাতিরে নজরুল নিজের জীবনের সুখ, আনন্দকে তোয়াক্কা করেননি। তিনি চাইলে বিত্ত-বৈভবের মালিক হতে পারতেন কিন্তু জেল খেটেছেন তবুও ভারতের প্রাণের দাবি স্বাধিকারের আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হননি। 'বিষের বাঁশী' নিষিদ্ধ করার জন্য নজরুলের তিনটি কাজকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সেখানে বলা হয় যে তাঁর 'ভয়ঙ্কর ভালো' কবিতা ও গানের মাধ্যমে একটি দাসব্রত-সাধক, পরলোকবাদী নিদ্রিত জাতিকে সচেতন করে তুলছে; সমালোচনা থাকলেও তাঁর রচনাকে কেউ ভালো না বেসে থাকতে পারে না এবং এভাবে চলতে থাকলে গানের পাশাপাশি তারা দেশকেই একসময় ভালোবেসে ফেলবে; আর তা হলে তাঁকে শাস্তি দেবার মতো লোক থাকবে না।[৬৩] এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায় 'ধূমকেতু'তে নজরুলের সর্বপ্রথম লিখিতভাবে অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে।

নজরুল মনে করেন স্বাধীনতা এমনি এমনি আসবে না; এর জন্য সংগ্রাম করতে হবে। তিনি বলেন-"পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।"[৬৪] এজন্য তিনি কলমকে গ্রহণ করেছেন মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে। এদিক থেকে নজরুলের কবিতা বলতে বোঝায় দেশাত্মবোধক কবিতা, বিপ্লবের কবিতা, নির্যাতন-বিরোধী কবিতা, ঘুম ভাঙানোর কবিতা।[৬৫] রাজনৈতিক পরাধীনতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য যৌবনে যে বিদ্রোহের ধ্বনি তাঁর কণ্ঠে নির্গত হয়েছিলো, পরিণত বয়সে সেই বিপ্লবের আহ্বান আরো তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়েছে।[৬৬]

নজরুল পরাধীনতাকে সব ধরনের অসাম্য, অন্যায়, অনাচার, অত্যাচার এর পেছনের কারণ হিসেবে দেখেছেন। বাংলার ইতিহাসের দিকে তাকালেও এর সত্যতা পাওয়া যায়। বাংলার প্রাচীনকাল থেকে আর্য-অনার্য, শক, হুন, তুর্কি, আফগানী, ডাচ, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি জাতি দ্বারা শাসিত হয়েছে। অত্যাচারী শাসকের ন্যায় তারা শুধু শাসনই করেছে, ভালোবাসেনি। তাদের শাসনের অন্যতম হাতিয়ার ছিলো তলোয়ার, চাবুক, গোলা প্রভৃতি। মানবতা সেখানে ছিলো ভূলুণ্ঠিত। তাঁর মতে, বাঙালির সবাই মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জেগে উঠলেই কেবল স্বাধীনতা অর্জিত হবে; সমাজের বিদ্যমান বিষবাষ্প উপড়ে যাবে। এ জন্য তিনি করণীয় সম্পর্কে বলেন-

> আর আমাদের নিরাশায় মুষড়ে পড়ে থাকার সময় নেই, সবাইকে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জাগতে হবে, গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে। আমাদের অন্তরে, বাহিরে, সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে মৃত্যুর বিষবীজ ছড়িয়ে আছে–সে করাল কবল থেকে আমাদের রক্ষা পেতেই হবে–আর তার জন্যে সর্বাগ্রে চাই স্বরাজ।[৬৭]

স্বরাজ বা স্বাধীনতা পেতে হলে আত্মনির্ভরতার পাশাপাশি ত্যাগ, ও বলিদান বাঞ্ছনীয় বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, স্বার্থত্যাগ করলেই পাওয়া যায় অন্তরের স্বর্গীয় তৃপ্তি। গোলামির আনন্দের মধ্যে প্রকৃত আনন্দ নেই। ইতর প্রাণীর মতো ঘৃণ্যভাবে হাজার বছর

বেঁচে থাকার চেয়ে সিংহের মতো একদিন বা একমুহূর্ত বেঁচে থাকার মধ্যে মাহাত্ম্য আছে। আত্মমর্যাদা সমুন্নত রাখার মধ্যেই পুরুষ্যত্ব ও বীরত্ব। কিন্তু যারা দেশের দুর্দিনে অস্ত্র না ধরে ঘুমিয়ে থাকার অভিনয় করে নজরুল তাদেরকে বন্য-পশু, বৃদ্ধ, মরা-পঁচার সাথে তুলনা করেন এবং তাদের শাসন না মানার জন্য তরুণদের আহ্বান করেন। 'আনোয়ার' কবিতায় দেশ সৈনিকের বিশ্বাসঘাতকতাকারীদের 'জানোয়ার' আখ্যা দিয়েছেন। এই ভণ্ডশ্রেণির মনের মধ্যে অর্থলোভী পশু বিদ্যমান থাকলেও লোকসমাজে তারা সভ্য মানুষের আড়ালে তাদের অন্তরের পশুকে আড়াল করতে চায়। নজরুল যুবকদের সমাজ থেকে সেই সকল বন্য-পশুদের খুঁজে বের করতে বলেন। তিনি বলেন-

তাদেরই ঐ বিতাড়িত
বন্য পশু আজি
মানুষ-মুখো হয়েছে রে
সভ্য সাজে সাজি
টান মেরে ফেল মুখোশ তাদের
নখর দণ্ড লয়ে
বেরিয়ে আসুক মনের পশু
বনের পশু হয়ে।[৬৮]

নৈতিকতার আলোচনাতে শাসক শ্রেণির কর্তব্য সম্পর্কেও দিক-নির্দেশনা দেন। নজরুল মনে করেন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসকদের উচিত নির্লোভ হওয়া। অন্যের সম্পদ পয়মাল করে তার উপর সম্পদের পাহাড় গড়া ধর্ম ও নৈতিকতা উভয়েরই পরিপন্থি। নজরুল বলেন-

> হজরত ওমর, হজরত আলি এঁরা অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছেন; কিন্তু নিজেরা কুঁড়ে-ঘরে থেকেছেন, ছেঁড়া কাপড় পরেছেন, সেলাই করে, কেতাব লিখে, সেই রোজগারে দিনপাত করেছেন। ক্ষিধেয় পেটে পাথর বেঁধে থেকেছেন; তবু রাজকোষের টাকায় বিলাসিতা করেননি। এমন ত্যাগীদের লোকে বিশ্বাস করবে না কেন ?[৬৯]

বুদ্ধের নীতিশিক্ষার মূল সূত্র-অহিংসা পরম ধর্ম।[৭০] গৌতম বুদ্ধ নির্বান লাভের জন্য যে *অষ্টাঙ্গিক মার্গের* কথা বলেছেন তার মধ্যে সম্যগ সমাধি অন্যতম। মানুষের মধ্যকার অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, চিত্ত-চাঞ্চল্য এবং চিত্ত-বিক্ষেপকে সংযত করাই এর মূল কথা। নজরুলও মনে করেন অহঙ্কার ও অহম জ্ঞানের জন্যই এই পৃথিবীতে রিপুর তাড়না জাগ্রত হয়, মানুষ পাপ কাজে লিপ্ত হয়। যতোক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তাঁর মন থেকে এই অহমজ্ঞান ও অহঙ্কারকে দূর করতে না পারবে ততোক্ষণ সে মুক্তি পাবে না। স্রষ্টার কৃপা লাভ করতে পারবে না। গৌতম বুদ্ধ মুক্তিলাভ বলতে দুঃখের মুক্তিকে বোঝালেও নজরুল মুক্তি বলতে বুঝতেন স্রষ্টার সান্নিধ্যকে যা হিন্দু ধর্মের চতুর্থ 'আশ্রম' বা সন্ন্যাসব্রত। নজরুল অহঙ্কারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করে বলেন-

অহঙ্কারের মূল কেটে দাও
অহম তরুর মূল কেটে দাও হরি !
আমার মূল আছে, তাই শত রিপুর জ্বালায় জ্বলে মরি।[৭১]

সত্য বলা আর মিথ্যা না বলা ধর্মীয় নৈতিকতার অন্যতম একটি দিক। সকল ধর্মেই সত্য-মিথ্যা নিয়ে রয়েছে স্পষ্ট নির্দেশ। সত্য-মিথ্যা আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানের সাথে সম্পর্কিত। তাই সত্যসংগ্রামী নজরুল 'সত্যের সম্মার্জনি' স্বরূপ ধূমকেতু পত্রিকা চালু করেন। 'ধূমকেতু'কে তিনি গ্রহণ করেন সত্য প্রকাশের বাহক হিসেবে। এজন্য কালিদাস রায় নজরুলকে 'তুমি নিজেই ধূমকেতু' এবং মিসেস এম, রহমান 'সত্য সাধক' হিসেবে দেখেছেন। 'সেবক' কবিতায় সত্য প্রতিষ্ঠায় বুক খুলে দাঁড়ানোর যে আহ্বান তার মধ্যে রয়েছে উপর্যুক্ত বিদগ্ধজনের উক্তির সত্যতা। কেননা তিনি ন্যায়ের ও সত্যের প্রশ্নে আপস করেননি। বিভিন্ন ধর্মান্ধ কর্তৃক সমালোচিত হয়েছেন, জেল খেটেছেন, অধিকার হরণের প্রতিবাদে অনশন করেছেন, জীবন বিপন্ন হয়েছে তবুও সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে পিছপা হননি। সত্য বললে অন্যের বিরাগভাজন হতে হবে, রাজরোষে পরিণত হতে হবে, নিজের জীবন বিপন্ন হবে তবুও তা হতে বিরত থাকা যাবে না; এটাই নজরুলের শিক্ষা। কেননা শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়। 'সত্য-মন্ত্র'তে সত্য সম্পর্কে তাঁর মত হলো সত্য স্বয়ম্ প্রকাশ ও এর জয় অবশ্যম্ভাবী এবং নির্যাতকের বন্দীকারা, রাজার অস্ত্র ও কারাগারের ফাঁস তাকে রোধিতে পারে না। নজরুল বলেন-

ওরে সত্য যে চির-স্বয়ম্ প্রকাশ
রোধিবে কি তারে কারাগার ফাঁস ?
ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন ? আছে তার আছে ক্ষয় !
সেই সত্য মোদের ভাগ্য-বিধাতা, যাঁর হাতে শুধু রয়।[৭২]

মিথ্যাচার মানুষকে কলঙ্কিত করে ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে; তার জন্য ক্ষতি বয়ে আনে, তাকে ধ্বংস করে দেয়। এ জন্য আল্লাহ বলেন, 'তোমরা মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাকো'[৭৩]। ইসলাম ধর্মে মিথ্যাকে সকল পাপের মা হিসেবে দেখে। বৌদ্ধ ধর্মের পঞ্চশীলের একটি হলো মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা। হিন্দু ধর্মে আলোচিত নৈতিক নীতিমালার যে সকল বিষয় পরিহার করার জন্য গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো মিথ্যা বলা।[৭৪] তাই নজরুল 'বিদ্রোহী-বাণী'তে মিথ্যার, কপটতার, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তিনি মনে করেন সত্যের শক্তিকে অস্বীকার করলে তার পতন অনিবার্য। এ সত্যকে হতে হবে সকল ধরনের কপটতামুক্ত, ভয়শূন্য। কিন্তু সত্যের মধ্যে ফাঁকি থাকায় বাঙালির স্বরাজ আসছে না বলে নজরুল মনে করেন। তাঁর ভাষায়-

দোহাই তোদের ! এবার তোরা সত্যি করে সত্য বল !
ঢের দেখালি ঢাক ঢাক গুড় গুড়, ঢের মিথ্যা ছল ।
এবার তোরা সত্য বল ॥
পেটে এক আর মুখে আরেক–এই যে তোদের ভণ্ডামি,
এতেই তোরা লোক হাসালি, বিশ্বে হলি কম-দামি।[৭৫]

নজরুল মনে করেন, মিথ্যার মহিমা গাওয়ার চেয়ে অপমান আর নেই। এক্ষেত্রে বৌদ্ধদর্শনের প্রতিফলন দেখা যায় নজরুলের মধ্যে। সত্য বলা সম্পর্কে বুদ্ধের মত হলো 'যেখানেই সে থাকুক বা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার নিজের সুবিধার জন্য বা অন্য কারো সুবিধার জন্য অথবা অন্য যে কোনো সুবিধার জন্য জ্ঞাতসারে সে কখনো মিথ্যে বলবে না'[৭৬]। তবে নজরুল বিশ্বাস করেন মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। ভুল করলে তা হতে সংশোধন হওয়া কর্তব্য;

এটাই কাম্য। ভুল করে সেটাকেই সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অনুচিত। 'আমার পথ' প্রবন্ধে নজরুল বলেন-"ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করেছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেবো ! কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গোঁ বজায় রাখবার জন্যে ভুলটাকে ধরে থাকব না।"[৭৭] নজরুল মিথ্যা বলাকে পাপের কাজ মনে করেন। তবে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে মিথ্যা, তাতে পাপ নেই বলে মনে করেন। বরং কিছু মিথ্যা আছে যাতে পাপ তো স্পর্শ করেই না বরং মিথ্যা বলেও সত্যনিষ্ঠ হওয়া যায়। প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক আল-রাজিও মনে করতেন সত্য-মিথ্যার নৈতিক মূল্য নির্ধারিত হয় তার উদ্দেশ্য দিয়ে। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যদি মিথ্যা বলা হয় তাহলে তা প্রশংসনীয় হতে পারে।[৭৮] কান্টের নৈতিক দর্শনেও রয়েছে অনুরূপ অভিমত। নজরুল বলেন-

মিথ্যা বলেছ বলিয়া তোমায় কে দিল মনস্তাপ ?
সত্যের তরে মিথ্যা যে বলে স্পর্শে না তারে পাপ।
গোটা সত্যটা শুধু তো সত্য কথা বলাতেই নাই,
মিথ্যা কয়েও সত্যনিষ্ঠ হতে পারি আমরাই ![৭৯]

অন্যের অনুগ্রহ প্রার্থনার পরিবর্তে নিজের প্রচেষ্টায় কর্ম সম্পাদনের প্রতি নজরুল গুরুত্বারোপ করেন। যারা শুধুমাত্র প্রার্থনা করে খোদার নিয়ামত পেতে চায় সেই সকল বৈরাগ্যবাদীদের সমালোচনায় নজরুল বলেন-"খোদার দেওয়া এই পৃথিবীর নিয়ামত হইতে যে নিজেকে বঞ্চিত রাখিল, সে যত মোনাজাতই করুক, খোদা তাহা কবুল করিবেন না। খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশতি চিজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিখারির মতো হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়।"[৮০]

ইসলাম ধর্মে তরুণদের বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ইবাদতের ক্ষেত্রে যুবকদের ইবাদতকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই যুবক শ্রেণির প্রতি নজরুলের ছিলো অগাধ বিশ্বাস। তিনি মনে করেন যে, কেবল যুবকরাই পারে সভ্যতাকে বির্নিমাণ করতে। তাই সিরাজগঞ্জ নাট্যভবনে মুসলিম তরুণ সম্মেলনে যুবকদের করণীয় সম্পর্কে নজরুল যে বক্তব্য দেন পুরোটাই ছিলো ধর্ম ও নৈতিক বক্তব্য। এই অভিভাষণে তিনি যুবকদেরকে বলেন, তাদের উচিত হবে যা কিছু পুরাতন, জরা এবং বার্ধক্যের বিরুদ্ধে অভিযান করা। এখানে বার্ধক্য বলতে নজরুল সংস্কারের পাষাণ স্তুপ আঁকড়ে ধরে থাকা ব্যক্তিদের বুঝিয়েছেন। তরুণদের উচিত নতুনকে গ্রহণ করা, পুরাতনকে বর্জন করা; নতুন নতুন জগৎ সৃষ্টির জন্য অগ্রসর হওয়া, কামাল-করিম-জগলুল-সানইয়াত-লেলিনের শক্তিতে শক্তিমান হওয়া, বৈমানিকরূপে আকাশের শেষসীমা খুঁজতে যাওয়া, গৌরীশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করা, সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আহরণ করা, মঙ্গলগ্রহে চন্দ্রালোকে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করা, নব নব গ্রহ-নক্ষত্র সন্ধান করা প্রভৃতি। এছাড়াও তরুণরা হবে অন্যের প্রতি মমতাময়ী ও উদার। তারা শ্মশানঘাটে শব নিয়ে যাবে, কবরস্থানে লাশ নিয়ে যাবে, দুর্ভিক্ষ-বন্যা-পীড়িতদের মুখে খাবার তুলে দিবে, বন্ধুহীন রোগীর শয্যাপাশে বসে রাতের পর রাত জেগে থাকবে, এবং দুর্বলের পাশে দাঁড়িয়ে তার বুকে আশার আলো জাগাবে। যুবকদের কোনো দেশ-জাতি-ধর্মভেদ থাকবে না, তারা সকল কালের, সকল

দেশের এবং সকল জাতির। ক্ষুদ্র জাতির মধ্যে তারা আবদ্ধ থাকবে না। পথ-পার্শ্বের যে অট্টালিকা পড় পড় অবস্থায় রয়েছে তা ভেঙ্গে ফেলবে। কেননা তা অনেক মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। যারা জেগে জেগে ঘুমাচ্ছে, অন্যের উপর ভর করে মুক্তির স্বপ্ন দেখছে, পরকালের মুক্তির আশায় ইহলোকে পশুর জীবন গ্রহণ করছে সমাজের সেই সকল লোকদের জাগাতে বলেন। কারণ ইসলাম বৈরাগ্য পছন্দ করেন না।

নজরুল সমাজ থেকে ধর্ম ও নৈতিকতার পরিপন্থী যাবতীয় অন্যায়, অকল্যাণ, পীড়ন, অশান্তি, মিথ্যা, ভ্রান্তি, অপৌরুষ, অভাব, ব্যাধি, শোক-দুঃখ, দৈন্য, গ্লানি, বিদ্বেষ, অসৎ, অবিদ্যা, লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রপ্রেমের শূদ্রামি, স্বার্থান্ধতা, বিশ্বাসঘাতকতা, কপটতা, ভণ্ডামি, আত্মপ্রবঞ্চনা, দাসত্ব, অত্যাচারী মনোভাব, বিবেকহীনতা, ঘৃণা, ধর্মান্ধতা, ভীরুতা, প্রতারণা, দুর্বলতা, অহংকার, গোলামি, মোসাহেবি, পক্ষাপাতমূলক আচরণ প্রভৃতি দূর করে এর পরিবর্তে সততা, শান্তি ও সাম্যের ভিত্তিতে নৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী ছিলেন। এজন্য তিনি এমন যৌবন দেখতে চান, যে কোনো অবস্থাতেই ন্যায়ের পথ থেকে পিছু হটে না, পরজয় মানে না, রণক্ষেত্রে জীবন দেয় তবু পলায়ন করে না। নজরুল মনে করেন সকল ধরনের লোভ-লালসার পথ ত্যাগ করে চলা তরুণদের কর্তব্য। কেননা বাঙালি জাতির অধঃপতনের মূল কারণ হলো আদর্শ চ্যুতি। সেই আদর্শে ফিরে আসার জন্য নজরুল বলেন-

> অন্যের মাল পয়মাল করে করে নিজে ধনী হওয়ার গুপ্ত লোভ তার অন্তরে জটিল সাপের মত ফণা গুটিয়ে আছে। তার মাথায় মণি থাকলেও সে বিষধর ফণী। তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। যে তরুণের বাজুতে শোভা পেত এসম্ আজমের তাবিজ, সেই হাতে বাঁধা আজ ভোট ভিক্ষার ঝুলি। যে কণ্ঠের তকবির-ধ্বনি আল্লহর আরশ কাঁপিয়ে তুলতে পারে, সেই কণ্ঠে আজ নেতার জয়ধ্বনিতে হল কলঙ্কিত। হে তরুণ! তোমরা কি যাবে ঐ লোভের পথে ঐ গোলামির কশাইখানায় ?[৮১]

নৈতিকতার আলোচনাতে নজরুল শিক্ষার্থীদের কর্তব্যও আলোচনার বাহিরে রাখেননি। তিনি মনে করেন শিক্ষার্থীদের কর্তব্য হলো সকল ধরনের ভেদ-বিভেদের গ্লানি, বন্দীত্ব, বিধি-নিষেধের অর্গল ধূলিসাৎ করে নিজেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে তুলতে হবে। সকল ধরনের সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা দূর করে আলোর বা জ্ঞনের প্রদীপ জ্বালাতে হবে। ঈশ্বরের মতো প্রেমময়ী হতে হবে। নজরুল বলেন-

ধর্ম-বর্ণ-জাতির ঊর্ধ্বে জাগো রে নবীন প্রাণ !
তোমার অভ্যুদয়ে হোক সব বিরোধের অবসান।
সংকীর্ণতা ক্ষুদ্রতা ভোলো ভোলো,
সকল মানুষে ঊর্ধ্বে ধরিয়া তোলো !
তোমাদেরে চাহে আজ নিখিল জন-সমাজ
আনো জ্ঞান-দীপ এই তিমিরের মাঝ,
বিধাতার সম জাগো প্রেম-প্রোজ্জ্বল ॥[৮২]

ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনে কঠোর হতে নজরুল পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন অত্যাচারীর নিকট মায়াকান্না করে লাভ নেই, তার ঘাড় মটকাতে গেলেই কেবল সে তোমার অনুরোধে কান দিবে নতুবা অন্যায় সহ্য করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।

অন্যায় শাসকের বিরুদ্ধে মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে নজরুল বলেন-"যাকে অন্যায় বলে মনে করো, বুক ফুলিয়ে তাকে অন্যায় বলো, দেখবে–অন্যায়ের মুখ কালো হয়ে যাবে। যাকে অন্যায় মনে করো, তাকে বিনাশের জন্যে তোমার বজ্র-আঘাত অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করো, দেখবে– অন্যায় আপনি 'গায়েব' হয়ে গেছে।[৮৩]

উপসংহার

নজরুলের সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি তাঁর পুরো সাহিত্যেই ধর্মীয় নৈতিকতার যে সকল বিষয় আলোচনায় এনেছেন সেগুলো কোনা না কোনোভাবে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি প্রধান ধর্মগুলোর পাশাপাশি জৈন, শিখ, তাও, শিন্তো ধর্ম ও কনফুসিয়াসের নৈতিক নীতিগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছে। মূলত সকল ধর্মের নৈতিক নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে অনেক সাদৃশ্য। সকল ধর্মই মানুষের মানবিকতার উপর জোর দেয়। তাই ধর্মের প্রতি আস্থাশীল ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে পারদর্শী নজরুল, সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে মানবীয় গুণের বিকাশের জন্য যে সকল বিষয় অনুসরণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন তার প্রত্যেকটি ধর্মীয় নৈতিক বিধানের সাথে সম্পর্কিত হয়েছে। তিনি ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার অপচর্চাকারী ধর্মান্ধদের সমালোচনার মাধ্যমে তাদের মধ্যে ধর্মীয় উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি কুসংস্কার, জাতি-ধর্ম-বর্ণভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি থেকেও দূরে থাকতে বলেন। দ্বিমুখী আচরণ, প্রতারণা, ফাঁকি দেয়া, চুরি করা বা অপ্রদত্ত বস্তু গ্রহণ ও আত্মঅহংকারকে তিনি দেখেন আত্মপ্রবঞ্চনা হিসেবে। আত্মপ্রবঞ্চনা মানুষকে অমানুষে রূপান্তরিত করে। অথচ তিনি মানুষকে দেখেন স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে এবং স্রষ্টার অবস্থান মানুষের মধ্যে অবস্থান বলে মনে করেন। ফলে মানুষের প্রতি মানবিক আচরণ করা, পক্ষপাতহীনমূলক আচরণ করা, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের জন্য সংগ্রাম করা, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সকলের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠাকে তিনি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। সর্বদা সত্য বলা এবং কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যাবে না বলে মত দিলেও তিনি অবশ্য মনে করেন সত্যের তরে যে মিথ্যা বলা হয় তাতে কোনো পাপ হয় না। বিনা প্রমাণে কোনো কিছু গ্রহণ না করা, অন্যের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পাওয়ার লোভ না করা, অদৃষ্টের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বরং নিজের চেষ্টায় ভাগ্য পরিবর্তন করা, নারীর প্রতি পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করা ছিলো তাঁর নৈতিক উপদেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এদিক থেকে বিচার করলে এটিই প্রতিয়মান হয় যে, সকল ভেদ-বিষাদের বিপরীতে নজরুল একটি নৈতিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ধর্মীয় নৈতিকতার অলোচনাই ছিলো তাঁর সাহিত্যের মুখ্য বিষয়। প্রেমের কথা যেখানে বলেছেন সেখানেও তাঁর মানবপ্রেমের শেষ পরিণতি স্রষ্টাপ্রেমে; স্রষ্টাপ্রেম অবার গিয়ে মিশেছে মানবপ্রেমে। নজরুলের সাহিত্যে ধর্ম ও নৈতিকতা সম্বলিত প্রত্যয় ব্যবহারের আসল উদ্দেশ্য ছিলো সাম্যভিত্তিক নৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। যেখানে মানুষ স্বীয় আত্মমর্যাদার সাথে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে। নজরুলের সাহিত্য অধ্যয়নপূর্বক তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারলে নজরুলের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে এক মানবিক বিশ্ব। সুতরাং ধর্মান্ধতা, অমানবিকতা, আত্মপ্রবঞ্চনা, দেশদ্রোহিতা, জিঘাংসা নয়, বরং উদারতা,

মানবিকতা, আত্মসচেতনতা, দেশপ্রেম, প্রেমই হোক বিশ্ব মানবজাতির মূল লক্ষ্য। পরম স্রষ্টাও তা-ই চান।

তথ্যসূচি:

---

১ হারুন-অর রশিদ, "ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান: মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি", *অন্বেষণ*, ৩য় খণ্ড, হেমন্ত সংখ্যা ৮ পর্ব (দর্শন বিভাগ: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭), পৃ. ১২৪

২ আমিনুল ইসলাম, *জগৎ জীবন দর্শন* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ৪৬

৩ রশীদুল আলম, *নৈতিকতা ও আমাদের সমাজ: বাঙালীর দর্শনের উৎস সন্ধানে* (বগুড়া: সাহিত্য সোপান, ১৯৯৬), পৃ. ১০৫

৪ এম. মতিউর রহমান, *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ৭২

৫ নজরুল ইসলাম, *উইলিয়ম জেমস ও জাঁ পল সার্ত্রের মানবতাবাদের আলোকে কাজী নজরুল ইসলামের মানবতাবাদ*, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৯), পৃ. ৯২

6 W. K. Frankena, *Ethics*, 2nd ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973), p. 28.

7 Janine Marie Idziak, "Divine Commands Are the Foundation of Morality", *in Contemporary Debates in Philosophy of Religion* (Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2004), p. 291.

8 R.N Sharma, *Introduction to Ethics* (Delhi: Surject Publications, 1993), p. 23.

৯ গোলাম দস্তগীর, "ঈশ্বর, ধর্ম ও নৈতিকতা", অন্ত. *দর্শন ও প্রগতি*, ৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯০), পৃ. ৫০-৫২

১০ আনোয়ারুল্লাহ ভুঁইয়া, *শিক্ষাদর্শন: তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১০), পৃ. ৮৮।

১১ D.M. Datta, *The Philosophy of Mahatma Gandhi* (Calcutta: Calcutta University Press, 1968), 83.

১২ নীরুকুমার চাকমা, *বুদ্ধ: ধর্ম ও দর্শন* (ঢাকা: অবসর, ২০০৭), পৃ. ৬৪

১৩ মুহাম্মদ আবদুল বারী, *নীতিবিদ্যা*,৩য় সং (ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ১৯৯৫), পৃ. ২৯৭

১৪ দশটি লক্ষণ হলো সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, চিত্তসংযম, চুরি না করা, সূচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ। দ্র. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম নৈতিকতা ও মানবকল্যাণ* (ঢাকা: সংবেদ, ২০১৭), পৃ. ৩২

১৫ পরেশ চন্দ্র মণ্ডল, 'হিন্দুধর্ম ও মানবতা', *শ্রী অঙ্গন* (ঢাকা: মহানাম সেবক সংঘ, ১৯৮২), পৃ. ৫৭।

১৬ S. Radhakrisnan, *The Principal Upanisads*, 4th print. (London: George Allen and Unwin, 1978), p. 104.

১৭ আজিজুন্নাহার ইসলাম, তদেব, ৩৬।

১৮ এম. মতিউর রহমান, *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ৯১

১৯ নীরুকুমার চাকমা, *বুদ্ধ: ধর্ম ও দর্শন* (ঢাকা: অবসর, ২০০৭), পৃ. ৬৪

২০ তদেব, পৃ. ৬৪-৫

২১ Ebrahim Moosa, Muslim Ethics?, in *Religious Ethics*, ed. William Schweiker (New York: Blackwell Publishing ltd, 2005), 238.

২২ মুহাম্মদ আবদুল বারী, তদেব, পৃ. ৩১২

২৩ মুহাম্মদ আবদুল বারী, তদেব, পৃ. ৩০৬

২৪ আজিজুন্নাহার ইসলাম, তদেব, পৃ. ৩৩-৪

২৫ Pritibhushan Chatterjee, *Studies in Comparative Religion* (Calcutta: Das Gupta and co., 1971), p.289.
২৬ রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন* (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০১৫), পৃ. ৫৮
২৭ আজিজুন্নাহার ইসলাম, তদেব, পৃ. ৩৫
28 Bertrand Russell, *An Outline of Philosophy* (London: George and Allen and Unwin Ltd, 1961), p. 263.
২৯ মোঃ মোজাহার আলী, তদেব, পৃ. ৭০
৩০ মোঃ শওকত হোসেন, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা* (ঢাকা: তিথী পাবলিকেশন, ১৯৮৮), পৃ. ৬১-৬৩
৩১ আহমদ শরীফ, *আহমদ শরীফ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, সম্পা. আহমদ কবির (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ২২৮
৩২ কামরুল আহসান, *নজরুল কাব্যে সাময়িকতা* (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০১), পৃ. ১৬
৩৩ আহমদ শরীফ, *একালে নজরুল* (ঢাকা:আগামী প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ১০
৩৪ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম* (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৮৮), পৃ. ১২৫
৩৫ কাজী নজরুল ইসলাম, 'কানার বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে', *নজরুল-রচনাবলী*, ১১তম খন্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১০), পৃ. ২৭২। অতপর খণ্ডসংখ্যাসহ 'নর' লিখিত হবে
৩৬ আল কোরআন, ১০৯:৬। সেখানে বলা হয়েছে 'তোমার ধর্ম তোমার কাছে আর আমার ধর্ম আমার কাছে',
৩৭ "গোঁড়ামি ধর্ম নয়" 'শেষ সওগাত', নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ১০৯
৩৮ "হিন্দু-মুসলমান" 'রুদ্র-মঙ্গল', নর ২য়, পৃ. ৪৩৭
৩৯ Philip H. Hwang, "An Inter-religious Dialogue: Its Reasons, Attitudes and Necessary Assumptions" in *The Global Congress of the World Religions*, Henry O. Thompson ed. (New York: The Rose of Sheraton Press, 1982), p. 80.
৪০ "ক্ষমা করো হজরত!!" 'ঝড়', নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ১৪২
৪১ পারভীন আক্তার জেমী, *নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১০), পৃ. ১২৩।
৪২ উদ্ধৃতি: রেজিনা আকতার আলম, *নজরুলের মানবতাবাদী দর্শন* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৪৫
৪৩ "ছুঁৎমার্গ" 'যুগবাণী', নর ১ম, পৃ. ৩৯৩
৪৪ আল কোরআন, ৬:১২
৪৫ M.A. Macauliffe, *The Sikh Religion*, Vol. I (Oxford: Clarendon Press, 1909), 330.
৪৬ "জাতের বজ্জাতি", 'বিষের বাঁশী' নর ১ম, পৃ. ১৩৪
৪৭ পারভীন আক্তার জেমী, তদেব, পৃ. ১২৪
৪৮ 'বনগীতি, ২য় খণ্ড', নর ৭ম, পৃ. ১১৫
৪৯ আহমদ শরীফ, তদেব, পৃ. ১১০-১১
৫০ "নারী", 'সাম্যবাদী', নর ২য়, পৃ. ৯০
৫১ "ছুঁৎমার্গ" 'যুগবাণী', নর ১ম, পৃ. ৩৯২
৫২ "ছুঁৎমার্গ" 'যুগবাণী', নর ১ম, পৃ. ৩৯৩-৪
৫৩ "আমার পথ", 'রুদ্র-মঙ্গল'. নর ২য়, পৃ. ৪২০
৫৪ "বাঙালির ব্যবসাদারি" 'যুগবাণী', নর ১ম, পৃ. ৪০৭
৫৫ "অভিভাষণ", নর ৮ম, পৃ. ৩৫
৫৬ "মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা " 'দুর্দিনের যাত্রি', নর ২য়, পৃ. ৪০৬-৭
৫৭ "বাঙালির ব্যবসাদারি" 'যুগবাণী', নর ১ম, পৃ. ৪০৫
৫৮ "গোঁড়ামি ধর্ম নয়" 'শেষ সওগাত', নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ১০৯
৫৯ "তরুণের সাধনা" 'অভিভাষণ', নর ৮ম, পৃ. ১৫

৬০ আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৮৫), পৃ. ৩
৬১ "রিক্তের বেদন", নর ২য়, পৃ. ২৩৪
৬২ "লাঞ্ছিত", নর ৭ম, পৃ. ১৪
৬৩ মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *সমকালে নজরুল ইসলাম* (ঢাকা:কথাপ্রকাশ, ২০১৫), পৃ.৭১
৬৪ "ধুমকেতু'র পথ" 'রুদ্র.মঙ্গল', নর ২য়, পৃ. ৪২৮
৬৫ গোলাম মুরশিদ, *বিদ্রোহী রণক্লান্ত: নজরুল জীবনী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশনী, ২০১৮), পৃ. ১১৪
৬৬ পারভীন আক্তার জেমী, তদেব, পৃ. ৩৩
৬৭ "মুশকিল", নর ৭ম, পৃ. ১১
৬৮ "জাগরণ", 'প্রলয়-শিখা', নর ৪র্থ, পৃ. ১১১-২
৬৯ "অভিভাষণ", নর ৮ম, পৃ. ৩০
৭০ রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন* (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০১৫), পৃ. ৭৮
৭১ "অগ্রন্থিত গান", নর ১১তম, পৃ. ২৬৭
৭২ "অভয়-মন্ত্র", 'বিষের বাঁশী' নর ১ম, পৃ. ১২০
৭৩ আল কোরআন, ২২: ৩০
৭৪ মুহাম্মদ আবদুল বারী, তদেব, পৃ. ২৯৮
৭৫ "বিদ্রোহী বাণী", 'বিষের বাঁশী' নর ১ম, পৃ. ১৪২
৭৬ নীরুকুমার চাকমা, তদেব, পৃ. ৬৫
৭৭ "আমার পথ" 'রুদ্র.মঙ্গল', নর ২য়, পৃ. ৪২২
৭৮ আমিনুল ইসলাম, তদেব, পৃ. ১৩৮
৭৯ "মিথ্যাবাদী" 'সাম্যবাদী', নর ২য়, পৃ. ৮৮
৮০ "তরুণের সাধনা" 'অভিভাষণ', নর ৮ম, পৃ. ১০
৮১ "অভিভাষণ", নর ৮ম, পৃ. ৪১
৮২ "ছাত্র-সঙ্গীত", 'অগ্রন্থিত গান', নর ১০ম, পৃ. ১৯৬
৮৩ "কানার বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে", নর ১১তম, পৃ. ২৮৫